ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1469-1476
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.368

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ‘গোত্রহীন’: প্রতিবাদে, প্রতিরোধে

ড. সুভাষ মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the period following the Partition, some infiltrators entered India. However, their arrival was not always a source of happiness; rather, it often brought disruption and turmoil to human lives. The playwright Rudraprasad Sengupta's play *Gotrohin* (1973) is no exception and reflects this very idea. Into the family of the central character, Salek Ahmed Khan, enter intruders such as Enayet and Nilu, who are relatives of his wife Zainab. In reality, they come to India from Chittagong, Bangladesh, in search of work and financial stability.

However, their arrival casts a shadow of disaster over Salek Ahmed Khan's family. Due to his experiences working at the docks, Salek does not easily trust people. Yet, paradoxically, he places blind trust in Enayet and Nilu, and like a tragic hero under the control of fate, his life moves toward a sorrowful end. Nilu, while being sheltered in their home, falls in love with Shaheen, which Salek cannot accept. In trying to separate Nilu from Shaheen, cracks begin to appear in the mutual trust within his own family.

Despite his efforts to reclaim his "honour and rightful dignity," the protesting Salek fails. Ultimately, centering on the issue of illegal entry into India, Salek informs the police, which leads to conflict with Enayet. In the ensuing confrontation, Salek is killed at Enayet's hands.

Through this narrative, the playwright seeks to portray how the intrusion of displaced individuals can lead to the deterioration of interpersonal relationships, thereby endangering the harmony of a well-structured family life.

Keywords: Rudraprasad Sengupta, *Gotrohin*, Drama, Family, India

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (জ. ১৯৩৫) অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার এমন একাধিক পরিচয়ে তিনি পরিচিত। যদিও তাঁর রচিত নাটকের অধিকাংশই বিদেশি নাটকের রূপান্তর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। তবে নাট্যপ্রাণ এই মানুষটি ১৯৬১ সালে ‘নান্দীকার’ নাট্যগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়েছেন। ১৯৭০ সালে এই নাটগোষ্ঠীতে নাট্যপরিচালক রূপে কাজ করেন। যদিও তিনি পরিচালক রূপে কাজ করেছেন প্রথম ‘আন্তিগোনে’ নাটকের মধ্যে দিয়ে। তবে বেশি করে নাটক মঞ্চস্থ করবার অভিপ্রায়ে তিনি ভালো নাটকের সন্ধান করে গেছেন। কারণ যে নাটক অভিনয় হবে তা হবে মূলত পেশাদারির মতো। তিনি এমন নাটক গ্রহণ করতে চেয়েছেন যেখানে নাটক আর্টিস্টিকালি চ্যালেঞ্জিং রূপে প্রতিভাত হবে, আর তার অভিনয়ে তথা প্রযোজনায় দর্শকদের চাহিদায় গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে একাধিকবার। অন্যদিকে তিনি দেখতে পান মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখের নাটক তখন অন্যত্র প্রযোজিত হচ্ছে, এই সময় তাঁদের দলের

প্রয়োজনে এমন কোনো নাট্যকারের সন্ধান করেছিলেন যার দ্বারা নাটক লেখা যেতে পারে। কিন্তু তেমন নাট্যকারের সন্ধান তিনি পাননি। এই কারণেই নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বিদেশি নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন—

> "...অজিতেশ বেঁচে থাকতে এবং এখনো নান্দীকার এমন একটা থিয়েটার গ্রুপ যেটা প্রফেশনাল হতে চায়। যে প্রত্যেককে পে করে মানে মান্থলি বেসিস। খুবই কম হলেও মান্থলি বেসিসে পে করি আমরা। সে রকম একটা দল চালাতে গেলে যে কি করতে হয়, একি ভাবছে ওকি করছে ও কেন থাকছে না, ও কেন কম আসছে, আর সেগুলো আনফর্চুনেটলি অধিকাংশই আমার ওপরে এসে পড়ে। এইসবের ফলে আমি কখনোই সময় পাইনি, নাটক লেখবার। অবসর পাইনি। থিয়েটার প্রোডাকসন করতে গেলে আমি ফেল করে যেতেই পারি কিন্তু ওটা আমার কম্পালসন। নাটক লেখাটা আমার কাছে কম্পালসন হয়ে ওঠেনি..."[১]

সহজেই অনুভব করা যায়, থিয়েটারের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর এই কারণেই নাটক রচনার থেকে থিয়েটার তাঁর কাছে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তবুও বিদেশি নাটকের রূপান্তরের মাধ্যমে তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করেছেন।

থিয়েটারের প্রয়োজনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রচনা করেছেন যে নাটকগুলি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (১৯৬৭), 'ফুটবল' (১৯৬৭), 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' (১৯৬৯), 'গোত্রহীন' (১৯৭৩) প্রভৃতি। নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের (১৯১৫-২০০৫) নাটক অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন একাধিক নাটক। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখা ভালো, পাশ্চাত্য জগতের বিশেষ করে আমেরিকায় বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মূলত প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন এই ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় আর্থিক সংকটের পথকে প্রসারিত করে দেয়। ১৯২৯ সালে এই পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। দেখা যায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যুবকদের বেকারত্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর এই আর্থিক সংকটের অভিজ্ঞতার নিরিখে আর্থার মিলারের ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয়েছে— 'Death of a salesman' (১৯৪৯), এবং 'A view from the Bridge' (১৯৫৫)-এর মতো নাটকগুলিতে।

'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকটি আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের 'Death of a salesman' (১৯৪৯) অবলম্বনে নির্মিত। আর্থার মিলারের সেলস্‌ম্যান যেন কলকাতার ফেরিওয়ালা রূপে পরিগণিত হয়েছে। নাটকে ফেরিওয়ালা অমলকান্তির কাছে তার দেখা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে গেছে। আসলে ফেরিওয়ালাদের স্বপ্ন দেখতে নেয়, দেখাতে হয় তা হয়তো অমলকান্তি ভুলে গেছে।

'গোত্রহীন' নাটকটিও আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের লেখা 'A view from the Bridge' (১৯৫৫) অবলম্বনে রচিত। দেখা যায়, মূল নাটকে একজন সাধারণ শ্রমিকশ্রেণি মানুষের বিয়োগান্ত পরিণতি এই নাটকের মূল উপজীব্য। আইন বহির্ভূত অনুপ্রেবেশকারী Rodolpho-এর বিষয়ে নীরবতা আর বিধিভঙ্গের দায়ে মূল চরিত্র Eddie'-এর করুণ ট্র্যাজিক পরিণতি এই নাটকের আলোচ্য বিষয়। তবে 'গোত্রহীন' নাটকে নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দেখালেন Eddie-এর ভূমিকায় সালেক আহমেদ খানকে আর Rodolpho-এর ভূমিকায় নীলুকে, Catherine রূপে শাহীনকে, Manco রূপে এনায়েৎ আলি মনুকে। এইরূপে তিনি সকল চরিত্রগুলিকে পরিবর্তন করেছেন। প্রথমেই খোন্দকার মহম্মদ হারুণের মাধ্যমে নাটকের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

মূল নাটকের মতোই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'গোত্রহীন' নাটকটিও দুটি অঙ্কের দ্বারা নির্মিত। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় সালেক, স্ত্রী জয়নাব এবং শাহীনকে নিয়ে তাদের সুখীপরিবার। শাহীন ছিল জয়নাবের মরা বুইন নইলার মাইয়া। যে পরিবারের সদস্যরা কখনোই ভাবেনি একে অপরের প্রতি তারা কখনো বিমখু কিংবা অবিশ্বাসী হতে পারে। তাই এই পরিবারে অন্য কাউকে বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়াতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। কেননা বিপদ মানুষের যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে। এই কারণেই হয়তো সালেক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এইরূপে—

> "এইখানে আমার কত বড়ো সম্মান! আইজ ভাইবতাছিলাম—ধরো, আমার আব্বাজান এই ইন্ডিয়ায় আসে নাই...আর আমি সেইখানে গেরামের আর পাঁচজন সমর্থ জোয়ানের মতো প্যাটে কিল দিয়া ঘুইরা ব্যাড়াই..."[২]

সত্যিইতো কর্মহীনরূপে মানুষের জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। ভারতে বসবাস করে নিজের মতো করে সে তার পরিবারকে সুখী রাখতে পেরেছে। একজন শ্রমজীবী মানুষ রূপে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে।

আত্মীয়তার সূত্রে জামাই রূপে সালেক শাহীনের স্বপ্ন এবং তার জীবনের লক্ষ্য পূরণে সর্বদাই অবিচল থেকেছে। এই কারণেই কলিম স্ট্রিটে একটা বড়ো পাইপের কোম্পানিতে তিন হাজার টাকার বেতনে স্টেনোগ্রাফার রূপে শাহীন কাজ করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সালেক রাজি হয় না, যদিও এই কাজে পরবর্তীতে শাহীনের সেক্রেটারি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তবুও সালেক তাকে লেখাপড়া শেষ করার কথা বলেছে। আসলে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মতোই সে চেয়েছিল—

> "আমি চাই তুমি খানদানি লোকেদের সঙ্গে মেশবা—ভালো জায়গায় ভালো অফিসে কাম করবা। এ্যাকটাই কথা—যদি এইখান থিকা চইলে যেতে চাও, যাও। কিন্তু এ্যাক নরক থিকা আর এ্যাক নরকে যেয়্যে পইচো না!"[৩]

তবে জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষের বিচিত্ররূপ সে ভালোভাবেই অনুভব করেছিল। এই কারণেই শাহীনকে বাইরের মানুষজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সালেক জানায়—

> "...সকল মানুষই মানুষ হয় না। হুঁশিয়ার না থাকলে লোকে তারে কাঁচা চিবাইবে! [শাহীনকে] কথাডা মনে রাখিস—যতো কম বিশ্বাস করবি, ততো কম দুঃখ পাবি।"[৪]

তবে এই কঠিন নিস্তরঙ্গ জীবনে যতটা সততার প্রয়োজন, সেটুকু তার ছিল। জাহাজের ডকে কাজ থাকলে সে কাজ পেতো। রোজগারের সবটুকুই সে বাড়ি নিয়ে আসতো। এইভাবেই সালেকের সাধারণ সুষ্ঠু জীবন অতিবাহিত হয়। আর এমন পরিবারেই জয়নাবের জ্ঞাতি ভাইয়েরা আসার পর থেকেই তাদের জীবনে নেমে আসে এক ট্র্যাজিক পরিণতি। সেখানে জীবনের নানা টানাপোড়েনে সমস্যা এসে উপস্থিত হয়। আসলে জয়নাবের খালাতো ভাইয়েরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কোনো এক গ্রাম থেকে ভারতবর্ষে কর্মের উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে আসে। তবে এই বাংলাদেশ থেকে কীভাবে মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে তা সালেক জানায়—

> "আপটু বটম কাপ্তান থিকা আমাগো তৌফিক পইর্যন্ত পয়সা খাওয়ানো আছে না!"[৫]

আসলে উদ্‌বাস্তু মানুষেরা কীভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তার প্রতি একটি ইঙ্গিত নাট্যকার এখানে প্রতিভাত করেছেন। সালেকের পরিবারে আসা জয়নাবের জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে এসেছিল বছর বত্রিশের চাষী এনায়েৎ আর সঙ্গে ছিল তার ভাই নীলু। নীলুর সম্পূর্ণ নাম ছিল হেদায়েৎ আলি নীলু। বেশি বেশি রোজগারের আশায়

এনায়েৎ ভারতবর্ষে পাঁচ-ছয়বছর থাকতে চেয়েছে। কেননা এনায়েৎ-এর পরিবারে আর্থিক সংস্থানের অভাবে তার স্ত্রী এবং তিন ছেলেকে অভুক্ত থাকতে হয়।

ভবিষ্যৎ-এর কথা যেমন কেউ জানতে পারে না, সালেকও তা জানতে পারেনি। সালেকের মতো একজন সাধারণ মানুষের জীবনেও যে ট্রাজেডির নায়কের মতো করুণ পরিণতি ঘনিয়ে আসবে তা সে কখনো ভাবতে পারেনি। আসলে এই শ্রেণির মানুষেরা কাজ করে, পরিবার প্রতিপালন করে, আড্ডা মারে, খায়, বুড়ো হয়, তারপর সে মরে যায়। কিন্তু সে দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ-এর এক অচেনা রূপ যা তার জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনে। আর এই বিপর্যয় আসে এইরূপে যেখানে একজন অভিভাবকের মতোই শাহীনকে সে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু অন্যদিকে সিনেমা হল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নীলুকে নিয়ে শাহীনের সময় অতিবাহিত করা মেনে নিতে পারে না সালেক। কেননা সালেক জানায়—

"এই পোলাডা ভালোই! তারে দ্যাখলেই আমার সারা শরীর গুলায়..."[৬]

আর এইখানেই শুরু হয় পরিবারকে বিপন্ন করে তোলার প্রাথমিক ধাপ। আসলে শাহীনের সঙ্গে নীলুর বিয়ের প্রস্তাবে সালেক রাজি নয়। কেননা এই ছেলের স্বাভাবিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সে, এমনকি সকলে এই ছেলেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে— 'চিটা গাঙের মেমসাহেব'। নীলুর আচার-আচরণ কিংবা তার ব্যবহার সবকিছুই সালেকের খারাপ লাগে। আবার একদিকে তার মাথার লম্বা চুলের জন্য নীলুকে সে যাত্রা দলের সখী বলে মনে করে তেমনি অন্যদিকে ডেকের ওপর নৃত্য সহকারে সংগীত করাটাকে সালেক খারাপ বলে মনে করে।

তবে সালেকের পরিবারে স্ত্রী জয়নাব নীলুর সঙ্গে শাহীনের বিয়েতে রাজি হয়েছে এবং সে ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে সালেককে বোঝাতে কিন্তু সে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়ে যেন বলতে থাকে—

> "ঝামেলা তো কিছু করি নাই! কিন্তু তাইর অর্থ এই না—আমি চুপচাপ শুধু দেইখ্যে যাবো! সেই মালের জইন্য আমি ঐ মাইয়ারে বড়ো করি নাই!"[৭]

অন্যদিকে শাহীনও চেষ্টা করে সালেককে তাদের বিয়েতে রাজি করানোর জন্য, এমনকি নীলুকে দেখতে কিংবা সহ্য করতে না পাওয়ার প্রসঙ্গে শাহীন তাকে বোঝায় যে সালেক আসলে ভুল বুঝেছে। কেননা নীলু তাদের দুজনকে ইজ্জত দেয়। সালেক তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে অনড় থাকে এবং নীলুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শাহীনকে মনে করিয়ে দেয় যে, লিগালি ইন্ডিয়ার সিটিজেন হবার অভিপ্রায়ে নীলু তাকে বিয়ে করতে চায়। নীলু যে তার জন্য উপযুক্ত নয় সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সালেক আরও জানায়—

> "প্রথম উপার্জন কইর‍্যাই সে একখান চকমইক্যা জ্যাকেট কেনছে, গাদা-গাদা ক্যাসেট কেনছে, এ্যাকখান ছুঁচলি জোতা কেনছে—ঐ দিকে তার ভাতিজারা যক্ষ্মায় মরে! তার মাথার মইধ্যে চৌরঙ্গীর আলো ঝলমলায়—সে হেরাফেরি করে! অরে তুই বিয়া করবি? বিয়ার পরে আবার তারে দ্যাখতে পাবি যেদিন সে তরে তালাক দিতে আসবে!"[৮]

আসলে তার মধ্যে দায়িত্ব কিংবা নিজেদের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে সে বাস্তাবানুগ নয়, খাম খেয়ালি স্বভাবের— এই সত্যটিকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

অন্যদিকে জয়নাবের পরামর্শে স্বাধীন এবং পূর্ণ নারীরূপে শাহীন সিদ্ধান্ত নেয়, সে নীলুকেই বিয়ে করবে। তার এই সিদ্ধান্তে সালেক উকিল হারুণের কাছে আসে, চেষ্টা করে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে শাহীন আর নীলুর মেলামেশা কিংবা বিয়ের সম্পর্ককে বাঁধা দিতে। যদিও হারুণ তাকে জানায়, একটা মেয়ে কোনো বিদেশির প্রেমে পড়লে—তাতে বে-আইনি কিছু ঘটে না। আসলে সালেকের মধ্যে কাজ করে ইগো, পরাজয় না মানার এক অদম্য জেদ। কেননা তার বাড়িতে আতিথ্য নেয় এমন এক ছেলে, যে তার অনুমতি না নিয়েই

শাহীনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে পর্যন্ত চলে যায়। এই কারণেই নীলুকে শায়েস্তা করতে যে ব্যবস্থায় বা উপায়ে ইললিগাল রূপে এরা ভারতে প্রবেশ করেছে সেই উপায়কে হাতিয়ার করে থানায় কিংবা ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করার কথা সে ভাবে। সালেক মনে করে এই সম্পর্ক তথা সমস্যা থেকে বার হবার এটাই একমাত্র সমাধান। দেখা যায় শাহীনের মঙ্গল চিন্তায় সে যেন আরও বিপদ বাড়িয়ে তোলে। সমাজের কোনো প্রকার সমস্যায় না জড়িয়ে পড়ে তার জন্য সালেকের এই সিদ্ধান্ত দেখে আইনজীবী হারুণ তাকে জানাতে ভোলেনি—

> "...প্রইত্যেক মানুষ কাউরে ভালোবাসে—বিবিরে, নয়তো বাচ্চারে, নয়তো আরও কারে—কিন্তু কখনও কখনও সেই ভালোবাসা তার সীমা ছাড়ায়্যা যায়। তখন সেইটা যে দিকে গতি ন্যায়, সেইট্যা হওয়া উচিত না! বোঝলা কথাডা?"[৯]

নিজের অভিভাবকত্ব নিয়ে নিজেই যেন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সালেক, কেননা সন্তানের মতো স্নেহে বড়ো করে তোলা শাহীন যখন অন্যের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, বিশেষ করে তার অপছন্দের মানুষের কাছে তাতে সে অপমানিত বোধ করেছে। সালেকের থানায় খবর দেওয়ার সিদ্ধান্তে হারুণ অনুধাবন করে ভবিষ্যত আসলে কোন পথে যেতে চলেছে—

> "হারুণ। এক একটা সময় আসে—যখন ইচ্ছা করে চিৎকার করে বলি, 'বিপদ বিপদ'! কিন্তু কি বিপদ—কারে বোঝাবো—কেমনে বোঝাবো?"[১০]

বলা যায় এই সূত্রকে অবলম্বন করে নাট্যঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সালেক নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি, এই কারণেই হয়তো তার পরিবারের মেয়েকে প্রেম কিংবা বিয়ের কথা জানালে নীলু এবং তার দাদা এনায়েৎকে অপমান করে আর তাদের উদ্দেশ্যে সে জানায়—

> "সে যদি কাম-কাজ্যের জইন্যই আইসা থাকে, তয় সেইটাই মন দিয়া করুক! আর যদি ফুর্তি মারণের জন্য আসে—এনায়েৎ, আমি তো জানতাম তোমরা রোজগার করতে আইছো এই দ্যাশে—নিজের জইন্য, পরিবারের জইন্য—"[১১]

দ্বিতীয় অঙ্কে এই সমস্যা আরও প্রবলরূপে ধরা দেয়। নীলু আর শাহীনের সকলের অনুপস্থিতিতে সালেকের ঘরে একে অপরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনকে ভালো চোখে দেখেনি সালেক, সে নীলুকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। নীলু শাহীনকে ভালোবাসে কিন্তু এই ভালোবাসা পেতে গিয়ে তাকে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। শাহীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তাকে নিয়ে সংসার করার প্রসঙ্গ জানালে নীলু প্রধান সমস্যার কথাটি শাহীনের কাছে ব্যক্ত করে—

> "...তুমি ভাবো—যারে ভালোবাসি না, তারেও বিয়া করবো শুধু ইন্ডিয়ার সিটিজেন হওয়ার লালসে?... এ কি ইন্দ্রপুরী? ... শুধু সাধারণ সৎ মানুষের জইন্য কাজ নাই সেখানে। এই দেশে এ্যাখনও কাজ আছে—শুধু কাজের জইন্যই এইখানে থাকতে চাই আমি—কাজ!"[১২]

আসলে নীলু একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারতবর্ষে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু যার বাড়িতে শাহীন বড়ো হয়ে উঠেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ শাহীনের ছিল আর এই কারণেই সালেককে সে ভুলতে পারেনি—

> "...আমি যদি ওর কষ্টের কারণ হই—আমার যে বড়ো লজ্জা করবে! আমি যে চিরকাল ভেবেছি—আমার যেদিন বিয়ে হবে—উনি হৈ-হৈ করবেন...হাসতে হাসতে আশীর্বাদ করবেন....চোখে জল নিয়ে আমায় বিদায় দেবেন—আর আজ সর্বক্ষণ কি খারাপ খারাপ কথা—কি দুর্বহার..."[১৩]

সালেকের আদরে বড়ো হয়ে ওঠা এবং তার জীবনে এই মানুষটির যে কোনো স্থান নেই তা বলার সাহস শাহীন কখনো দেখায়নি। তবে পরিস্থিতির চাপে এবং সময়ের পরিসরে 'পরিপূর্ণ নারী' রূপে বুইন মাসির মতোই তাকে আঘাত দিয়েছে—

"জামাই! মেসো! ছেড়ে দাও! আমি খুন করে ফেলবো তোমাকে! ছেড়ে দাও ওকে—"[১৪]

শাহীনের এই কথাতে সালেক নিজেকে আর সামলাতে পারিনি, সে কষ্ট পায়। তবে যখন সবকিছু কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাদের একত্র হওয়ার জন্য হারুণ সালেককে জানায় তদের আশীর্বাদ করার জন্য। তাকে আরও আশ্বস্ত করে হারুণ বলে—

> "সারা পৃথিবী তোমার দুষমন হয়্যে যাবে, সালেক! যারা তোমার মন বুঝে, তারাও মুখ ঘুরায়্যা নেবে! এ্যামনকি যারা এই এ্যাকই কষ্ট পায়, তারাও তোমারে ঘিন্না করবে!"[১৫]

আসলে সালেক তার 'হকের ইজ্জৎ' ফিরে পেতে চেয়েছে। সকল প্রকার বিবাদ মিটিয়ে বিয়েতে জয়নাব তাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য সালেককে রাজি করাতে চাইলেও, সে নিজের ইগোর লড়াইয়ে থানায় ফোন করে দুইজন অনুপ্রেবেশকারীর সম্পর্কে অভিযোগ জানায়। যারা বসবাস করে ৪৩ নম্বর পুরোনো মসজিদ স্ট্রিটে। সালেকের বাড়িতে পুলিশ আসে আর তাদের গেপ্তার করে। এই অবস্থায় এনায়েৎ-দের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, আর এই ভয়ানক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জয়নাব পুলিশদের উদ্দেশ্যে জানায়—

> "খোদার কসম—তারা কার পাকা ধানে মই দিছে? —কি চান তাদের থিকা? এইটা বোঝেন না—তারা সেইখানে না খাইয়া মরে! এনায়েৎ... মনু..."[১৬]

এনায়েৎ দিশেহারা হয়ে পড়ে কেননা তার পরিবার অভুক্ত থাকবে, এই কারণেই সালেকের উপর তার ক্রোধ চেপে যায়। একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে। সালেকের উদ্দেশ্যে এনায়েৎ বলতে থাকে—

> "সেই লোকটা বেইমান! সেই বেইমান আমার তিনটা পোলারে খুন করছে! সেই বেইমান আমার বাচ্চাদের মুখের ভাত ছিনায় নিছে!"[১৭]

যে এনায়েৎ কখনো খুন কিংবা দাঙ্গা করেনি তার মাথাতে খুনের নেশা চেপে ধরে। আবার শাহীনের বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনে জয়নাব যেতে চাইলে সালেক তার ইগোর লড়াইয়ে তাকে যেতে নিষেধ করে। এমনকি সে যদিও জোর-পূর্বক যায় তার জন্য সালেক স্ত্রী জয়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দেবার কথা জানায়। সালেক তার 'হকের ইজ্জৎ' ফিরে পেতে, তারা সকলে এসে তার কাছে মাফ চাইবে এটা সে আশা করেছিল। এই কারণেই শাহীন রেগে তাকে জানাতে ভোলেনি— 'এ্যাকটা চুকলিখোর— চুহা'। এইরূপে অকৃতজ্ঞ হয়ে শাহীন আরও জানায় যে সালেকের স্থান নাকি আস্তাকুঁড়ে কিংবা পচা নর্দমায়। যদিও স্বামীর উদ্দেশ্যে বলা শাহীনের এইকথাগুলি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি জয়নাব আর এই কারণেই সে জানায় যা কিছু ঘটেছে এই দায় সকলের। আসলে এনায়েৎ সারা মহল্লার সামনে সালেককে বেইমান কিংবা তার বাচ্চাগো-জল্লাদ বলাতে সালেক তা ভালোভাবে নেয়নি, ক্রমশ তারা একে অপরের দুষমনি হয়ে ওঠে।

নীলু সবকিছু ভুলে একে অপরের মধ্যে মিল করার চেষ্টা করেছে, এমনকি সালেকের কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছে। তবুও সালেক নিজের ইগো কিংবা জেদের কাছে হার না মেনে তার জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। কারণ পরাজয় না মানার অদম্য জেদকে অনড় রেখেছে তার বলা এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে—

> "আমি—এই মানুষটা—আমি তার মাথায় ছাত দিছি, নিজের গেরাস তার মুখে তুইল্যা দিচ্ছি, নিজের গেরাস তার মুখে তুইল্যা দিচ্ছি? কোরাণে তো সেইটাই কয়। জীবনে চিনি নাই যে মানুষেরে...আমার ঘরের মেজেতে পাও রাইখ্যা সিটিজেন হবার লোভে কচি ম্যাইয়াডারে

> ফুসল্যয়্যা লয়? এইটা এ্যাট্টা পরিবার ছিলো না?—এইটা কি রাণ্ডিখানা ছিলো?—আমারে জিগাইলাও না? আর বদলিতে আমিই এ্যাখন কাঠগড়ায়?"[১৮]

এই ভাবনায় যেন তাকে অবিচল করে তোলে, সালেক এনায়েতের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সালেকের মৃত্যু হয়।

আসলে জীবনের কিছু সত্যকে সালেক মানতে চায়নি আর এই কারণেই হয়তো তার জীবনে নিয়তি যেন মৃত্যু এনে দেয়। এই সত্যটি প্রসঙ্গে তাই হারুণ জানায়—

> "আজকাল আমরা অর্ধেকটা পেলেই খুশি মানি, প্রয়োজনে বাকি অর্ধেক ছেড়ে দিই। কিন্তু যা সত্য—সে'তো পাক পবিত্র। এবং যদিও জানি কতো বড়ো অন্যায় সে করেছিলো, কত অর্থহীন তার এই মৃত্যু—তবুও যখনই তার কথা স্মরণে আসে, আমি কাঁপি। অবাক হয়ে ভাবি, বিকৃতি কি করে এত পবিত্র এত সরল হতে পারে! সেই জন্যই হয়তো আমার আর পাঁচজন বুঝদার মক্কেলের চেয়ে চিরকালই চুপি চুপি ওকে আমি বেশি ভালোবাসবো।"[১৯]

নাটকটিতে বাংলাদেশ-ভারতবর্ষের বিশেষ করে খিদিরপুর পোর্ট অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিদ্যমান, যা মূল নাটক থেকে পৃথক করেছে। নাটকে দেখি এক সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। নীলুকে ভালোবাসার জন্য কন্যাসমা শাহীনের জামাই তথা মেসো সালেকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব যা তাদের পারিবারিক সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আসলে উদ্‌বাস্তু কিছু অনুপ্রবেশকারীর জন্য তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে নেমে আসে এক অমোঘ নিয়তি, যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। তবে নাট্যকারের এমন নির্মাণশৈলী প্রসঙ্গে আলোচক কুন্তল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অবিভাজিত কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পাদক ছিলেন। বাঙালি জীবনে বাস্তুহারা-উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর পরিচিত। কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কলহ-দ্বন্দ্ব-প্রেম-প্রীতির মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। ৭০-এর দশকের নকশাল মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তি-যুদ্ধ-এর অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ তিনি। সাম্প্রতিক অতীতের অবক্ষয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের হাল-হকিকৎ সবই তাঁর জানা।"[২০]

এই অভিজ্ঞতার রসদেই তাঁর নাট্যভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট ও জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে বেঁচে থাকার অভীপ্সা। এমনকি তার সঙ্গে রয়েছে হতাশা আর অবসাদের গ্লানি।

তথ্যসূত্র:

১। সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ। "রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত: সুমন মুখোপাধ্যায়" (সুমন মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার)। 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২, শ্রীরামপুর, পৃ. ৩৬৮।
২. সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ। 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২, শ্রীরামপুর, পৃ. ২৬৪।
৩. তদেব, পৃ. ২৬৬।
৪. তদেব, পৃ. ২৬৭।
৫. তদেব, পৃ. ২৬৯।
৬. তদেব, পৃ. ২৭৭।
৭. তদেব, পৃ. ২৭৮।
৮. তদেব, পৃ. ২৮১।

৯. তদেব, পৃ. ২৮৭।
১০. তদেব, পৃ. ২৮৮।
১১. তদেব, পৃ. ২৯১।
১২. তদেব, পৃ. ২৯৬।
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৭।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৩০১।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০৯।
১৮. তদেব, পৃ. ৩১৪।
১৯. তদেব, পৃ. ৩১৫।
২০. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল। দ্র. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীরামপুর, পৃ. ৩২৭।